নীতি বর্জিত রাজনীতি গণআকাঙ্ক্ষাকে বলি দেয়
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি মূল্যবোধের পতন ঘটায়

দেশের রাজনীতিতে নীতিহীনতার চরম পরাকাষ্ঠা চলছে। ক্ষমতাসীন দল ও তাদের জোটবন্ধনীতে থাকা হরেক কিছিমের দলগুচ্ছ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের প্রধান শক্তি ও তাদের জোড়াতালি বেষ্টনীতে থাকা নানা হিসাবের দলসমূহ মিলে উন্নয়নের চমক, গণতন্ত্রের দোহাই, কৌশলের কারসাজি, সকাল-বিকাল-মধ্যরাতের ভোজবাজি ইত্যাদিতে জনগণের সাথে যে তামাসার খেলা খেলছে তা সত্যিই অভাবিত। এটা বুর্জোয়া, পাতিবুর্জোয়া রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের এক নিদর্শন। গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ ও নীতিবর্জিত রাজনীতি এ পরিণতি টেনে এনেছে। রাজনীতিতে শেষ কথা নেই বলে নীতিহীনতা ও সুবিধাবাদকে জায়েজ করা হচ্ছে। ভ্রষ্টতাকে কৌশল বলে চালানো হচ্ছে। যে কোন নীতি বাস্তবায়ন করতে হলে কৌশলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে কৌশল নীতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ তা অপকৌশল এবং সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। ছয় শ বছরের পুঁজিবাদ প্রগতির যা কিছু ছিল সব হারিয়ে বর্তমান কালে এসে বিশ্বকে চরম অশান্তিতে নিক্ষেপ করেছে। ৮ জন ধনীর হাতে তিন শ কোটি মানুষের সমপরিমাণ সম্পদ জমা করেছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের বুর্জোয়ারাও পিছিয়ে থাকছে না। ২০১২ থেকে ২০১৭ এই ৫ বছরে অতি ধনী বেড়েছে ১৭.৩%। সম্পদ বৃদ্ধির হারে বিশ্বে প্রথম। এত বড় উন্নতি সহজ কথা নয়! এর ফলাফলে বৈষম্য বাড়ছে বিপুলভাবে। ২০১০ থেকে ২০১৬ এই ৬ বছরে ৫% সর্বোচ্চ ধনীর আয় বেড়েছে ৫৭% আর ৫% সর্বনিম্ন গরিবের আয় কমেছে ৫৯%। লুটপাটসৃষ্ট অর্থনৈতিক দুর্দশার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দুই শ কিলোমিটার বেগের ফণী দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে পঞ্চাশ-ষাট কিলোমিটার বেগে বয়ে আসামে গেছে। তাতেও জীবনহানি, ঘরবাড়ি ভেঙে পড়া, ফসলের ক্ষতি ইত্যাদি ঘটেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ দু'ধরনের দুর্যোগ-ই রয়েছে। মানুষ প্রকৃতির সাথে লড়তে লড়তে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করে টিকে থাকার সাধ্য-সামর্থ যেমন বাড়াচ্ছে, তেমনি শিক্ষায়, সমাজ চেতনায় সভ্য সমাজ গঠনের ঐতিহাসিক তাগিদপূরণ করতে করতে মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ও কমিয়ে আনছে। মানুষের মিলিত স্বার্থ ও সমন্বিত চেষ্টা প্রতিকার ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে যদি সমাজে অসাম্য-বৈষম্য কমিয়ে বৈপ্লবিক রূপান্তরের পথে অগ্রসরমান থাকা যায়। তা না হলে অর্জিত শক্তি অপশক্তিতে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসেবে আমেরিকাকে আনা যায়। আমেরিকা যত সহজে আফগানিস্থান, ইরাক, লিবিয়ায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারে, নিজ দেশে হ্যারিকেন ক্যাট্রিনা (২০০৫ সালে নিউ অরলিয়ন্সে ১৮০০ মানুষ মৃত)সহ নানা দুর্যোগ থেকে মানুষ ও সম্পদ ততটা রক্ষা করতে পারে না। কিউবার সামর্থ্য সে তুলনায় অনেক কম কিন্তু দুর্যোগে জীবন ও সম্পদ রক্ষার কৃতিত্ব সে তুলনায় অনেক বেশি। (এ বছরেই ৮০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী টর্নেডোতে মৃত মাত্র ৪ জন)।

উন্নয়নের কথিত মহাসড়কে চলা আমাদের শাসকদের সাফল্যের দাবি অনেক, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতা কম। কারণ চোখের সামনের ঘটনা দূরের গালগল্পকে হার মানায়। ঢাকা শহরে এক সময় শিশু জিহাদ পাইপের গর্তে পড়ে গেলে গোটা রাষ্ট্রের শক্তি- সরঞ্জাম এক হয়ে বলে দিল গর্তে কোন মানবের অস্তিত্ব নেই। পরক্ষণেই পাড়ার ছেলেরা কসরৎ করে মৃত শিশুর লাশ বের করে এনেছিল। এবারের একটি ছোট ঘটনা। ফণীর আগে ঢাকায় 'নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ' (কেইস) প্রকল্পের অধীন কাকলী বাসস্ট্যান্ডের যাত্রীছাউনী ৩১ মার্চ সন্ধ্যার ঝড়ো বাতাসে উড়ে গিয়েছিল। ১ মাসেও তা মেরামত হয়নি। কাগজে সংবাদ পরিবেশিত হওয়ার পর মেরামত হয়েছে। এটা অসাধ্য ছিল না, অবহেলার নজির। আছে দুর্নীতিও। একই দিনের খবরে আছে ঢাকার বায়ুদূষণ রোধে পানি ছিটানোকে কেন্দ্র করে হাইকোর্ট ২ সিটি কর্পোরেশন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের ১৫ মে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গক্রমে আদালত বলেন, 'চোরকে চোর ও দুর্নীতিবাজকে দুর্নীতিবাজ বলতে হবে। না হলে দেশ রক্ষা করা যাবে না।' সত্যি কথা। কিন্তু চোরের মায়ের বড় গলা ছাপিয়ে বড় করে বলা যে কঠিন! আর ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টসহ আইনি ঝক্কি-ঝামেলা তো আছেই।

রাজধানীর জলাবদ্ধতা নিরসনে ১০ বছরে ১ হাজার ৫৬১ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। নগরীর খাল, ড্রেন পরিষ্কার ও সংস্কারসহ এই কাজে ওয়াসা ৬৮৩ কোটি, উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৭৭০ কোটি, পানি উন্নয়ন বোর্ড ১০৮ কোটি টাকা খরচ করেছে এই বলে যে ঘণ্টায় ৫০ মিলিমিটার বৃষ্টি হলেও পানি নিষ্কাশিত হবে। বাস্তবে ২০-৩০ মিলিমিটার বৃষ্টিতেই রাস্তা ডুবে যায়। রাস্তা পানি ভর্তি খাল-নদীর চেহারা ধারণ করে। এখন রোজার মাস। মন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন রোজার মাসে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো যাবে না। ব্যবসায়ীরা ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে আগে ভাগেই জিনিসপত্রের বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের দাম ২০% বাড়িয়ে দিয়েছে। 'দেশে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্যের মজুত না থাকলে দাম বাড়ে'–একথা বলা হয়, কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতি ভিন্ন। দেশে বছরে ১৪-১৫ লাখ টন চিনির চাহিদা রয়েছে। দেশীয় আখ থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার টনের মতো চিনি উৎপাদিত হয়। ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব বাজারে টন প্রতি চিনির মূল্য ছিল ২৯০ ডলার, যা–মার্চে ২৮০ ডলারে নামে। তাতে চিনি প্রতি কেজির দাম দাঁড়ায় ২৪ টাকা। অন্যান্য খরচ যোগ করলে ৩০-৩৫ টাকার বেশি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বাজারে ৫৫ টাকা থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। টিসিবির হিসেবে ১ মাসে ১০% দাম বেড়েছে। রোজায় গড়ে ৮০ থেকে ৯০ হাজার টন ছোলার চাহিদা তৈরি হয়। গত ৬ মাসে আমদানি হয়েছে ১ লাখ ১০ হাজার ৯৯৩ টন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য তো মজুদ আছে, তাহলে মূল্যবৃদ্ধির যুক্তি কী? আসলে মুক্ত বাজারের কথা বলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাজারকে ৫০-৬০ জন একচেটিয়া ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কাছে সঁপে দেয়া হয়েছে। তারাই বাজারকে ওঠায়-নামায়। শেয়ার বাজারেও চলছে অস্থিরতা, বাজারে টানা দরপতনে ২৫ দিনের ব্যবধানে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকা নাই হয়ে গেছে। ১৯৯৬ ও ২০১০ সালে শেয়ার বাজার কেলেংকারীর ঘটনা ও

হোতাদের বিচার হলে এখন এটা হতো না। ব্যাংকগুলোর অবস্থাও নাজুক। তবে বেসরকারি ব্যাংকের ১৫ জন ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ২ জন পরিচালক মিলে মোট ১৭ জন সাংসদ হয়েছেন। ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক, বনে গেলেন সাংসদ। পদ কী আর কাজ কী?

হতাশা, কাজের চাপ, নিরাপত্তাহীনতা ও বঞ্চনাজনিত কারণে আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। ২০০৯ থেকে ২০১৫ সারাদেশে আত্মহত্যা করেছে ৫৯৭৬০ জন। বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা প্রবাসীরাও ভাল নেই। ২০০৫ থেকে ২০১৬ দশ বছরে ২৮০০০ প্রবাসী শ্রমিকের লাশ এসেছে। ৭ মে খালি হাতে ২০০ শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে ফিরে এসেছে। প্রতিদিন প্রতারণা আর নির্যাতনের শিকার হয়ে দলে দলে প্রবাসে কর্মরত শ্রমিকরা ফিরছেন। দেশের সম্পদ বিক্রি করে, ধার দেনা করেই তারা বিদেশে গেছেন। এখন চোখে শুধুই অন্ধকার, পরিবারে হাহাকার। ৫ মার্চ ২০১৯ একটি সংবাদপত্র জানাচ্ছে, গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে মাদক বাণিজ্যে ৫৬ জন প্রতিনিধি, শতাধিক প্রভাবশালী নেতা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কয়েকশ সদস্য যুক্ত। ক্ষমতাসীন দলের ওয়ার্ড, থানা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ের নেতা, সংসদ সদস্য, সিআইপি ও সরকারি কর্মকর্তা মিলে ১৪১ ব্যক্তি মাদক মাফিয়ার নেপথ্য শক্তি হিসেবে চিহ্নিত। এরা তারপরও বহাল তবিয়তে এবং নিরাপদেই আছে। চলছে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, ক্রসফায়ার ও বন্দুক যুদ্ধ। ২০১১-১৭ এই ৭ বছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০৩৪৯ মামলা নিষ্পত্তি করেছে। ৯৯৫২ মামলার ১১৬৩৪ আসামি খালাস (৫২%)। ত্রুটিপূর্ণ এজাহার দাখিল, মামলার বাদী ও তদন্ত কর্মকর্তা একই ব্যক্তি, জব্দ তালিকায় বর্ণিত স্থানীয় সাক্ষীদের সাথে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের অমিল, জব্দ তালিকায় উল্লিখিত সাক্ষী ও অন্যান্য সাক্ষী হাজির করার ব্যর্থতা, উপযুক্ত নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য উপস্থাপনে ব্যর্থতা, মামলার বাদী ও তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষী না দেয়া, আইনের বিধান অনুযায়ী জব্দ তালিকা না করা, মামলার বাদী ও অভিযানকারী দলের সদস্যদের বক্তব্যে অমিল ইত্যাদি অসঙ্গতি মাদক অধিদপ্তর থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু এসবের প্রতিকার না করে আসল হোতাদের না ধরে শুধু ক্রসফায়ারের একঘেয়ে পুরনো গল্প নতুন করে শুনিয়ে কি প্রতিকার হবে? শ্রমিকদের কাজ এবং কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে না, গত বছর দেশে শুধু কর্মস্থলে ১০২০ শ্রমিক নিহত ও ৪৮২ জন আহত হয়েছেন। ৩৪ নারী শ্রমিক ধর্ষিত হয়েছেন, ১৭০ জন নিখোঁজ, ১২ জন গণধর্ষণের শিকার। পোশাক শ্রমিকের মূল মজুরি মালিক পক্ষ ২৩% বৃদ্ধি বললেও বাস্তবে ২৬% কমে গেছে বলে বিশেষজ্ঞ মতামতে জানা গেছে। শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র, সার্ভিস বই, ৮ ঘণ্টা শ্রমের নিশ্চয়তা, ন্যায্য মজুরি, ওভার টাইম কাজ ২ ঘণ্টার অধিক হবে না, নৈমিত্তিক ছুটি, পীড়া ছুটি ও উৎসব ছুটির ব্যবস্থা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মাতৃত্বাকালীন ছুটি, আবাসন-বিনোদন প্রশিক্ষণ, রেশন, কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, নারী-পুরুষ সমমজুরি ও সম আচরণ, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা, যথার্থ ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই। বিশ্ববাজার সম্প্রসারিত ও চাহিদা বৃদ্ধি সত্ত্বেও এক সময়ের দেশের প্রধান শিল্প খাত পাট শিল্পের অচলাবস্থা তৈরি করা হয়েছে। খুলনা-যশোরে পাটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট করতে হচ্ছে। তাদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করা হচ্ছে না। ৮/৯ সপ্তাহ থেকে ১১/১২ সপ্তাহের মজুরি বাকি। খালিশপুর জুট মিলের শ্রমিক হাফিজুর রহমান দুঃখ করে বলেন, 'আজ ৭ মে আমার মেয়ের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বাসায় যে একটু মিষ্টি নিয়ে যাব সেই টাকাটাও নেই।' এত উন্নতির বাংলাদেশে শ্রমিকশ্রেণির এই হাল। তিলোত্তমা রাজধানীতে ১৮ লাখ পোশাক শ্রমিক, ১০ লাখ নির্মাণ শ্রমিক, ৫ লাখ রিকশা-ভ্যান চালক, গৃহকর্মী-হকার-মুটে বেকার মিলে ৫০ লাখ মানুষ মানবেতর ঘিঞ্জি পরিবেশে বাস করে। দেশের মানুষ অর্থনৈতিক দুর্দশার পাশাপাশি নারী-শিশু নির্যাতন মহামারি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখন দেশে আইনের শাসন নেই বলে সবাই আহাজারি করছে। কিন্তু এটা তো অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, জনগণের আন্দোলন যত শক্তিশালী হয়, আইন-বিচার তত নিকটবর্তী হয়। আর আন্দোলন শিথিল কিংবা দুর্বল হলে আইন বিচার দূরবর্তী হয়ে পড়ে। অপরাধীর পেছনের শক্তি যত বড় বা নিজে যত বড় প্রভাবশালী হয়, আইন-আদালত ততো নিজস্ব নিয়ম ত্যাগ করে ভিন্ন নিয়মে চলে। আলোড়ন সৃষ্টিকারী হত্যাকাণ্ডের অন্যতম ঘটনা ছিল নিজ বাড়িতে সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড। ৬১ বার পিছিয়েছে এই হত্যার প্রতিবেদন। ৬ বছরেও ত্বকী হত্যা মামলার অভিযোগপত্র হয়নি। ৩ বছরেও তনু হত্যা মামলার অগ্রগতি নেই। কল্পনা চাকমা তো বিস্মৃত। এবার বিস্ময়করভাবে দেখা গেল যৌন নির্যাতনের শিকার নুসরাত জাহান রাফির হত্যাকাণ্ডের সাথে একযোগে পুলিশ (ওসি, এসপি), জেলা প্রশাসন (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক), মাদ্রাসা অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, স্থানীয় শাসক দলের সাথে যুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব সবাই যুক্ত রয়েছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, ব্যক্তিগত, দলগত সন্ত্রাস ইত্যাদি হচ্ছে। কিন্তু একটি জঘন্য কাজে এ ধরনের মেলবন্ধন ঘটা কীভাবে সম্ভব হলো? আসলে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন ও জনগণের অধিকার হরণের যে প্রক্রিয়ায় চলছে তার পরিণতি ভয়াবহ। বিশেষ করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেভাবে মধ্য রাতের মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাব কতোদিন কতোভাবে পড়তে থাকবে তা বলা কঠিন। গণপ্রতিরোধের শক্তিতে এ অবস্থা ঠেকাতে না পারলে এখানেই এটা থামবে না। তাই নুসরাত জাহান রাফি হত্যার বিচার আন্দোলনকে বিচারহীনতার রেওয়াজ বদলের জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লুটপাটতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে উদাসীন থেকে আন্দোলন গড়ে তোলা কিংবা এগিয়ে নেয়া কঠিন। অবস্থা বদলের জন্য ব্যবস্থা বদল দরকার। তাই রাষ্ট্র ও সমাজের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এর বিকল্প নেই।